আপনজন
অরবিন্দ রায়

চার

নদীর উৎপত্তিস্থল আছে। চলার পথ আছে, বিশালের সাথে সঙ্গমের মোহনা। এই চলার পথে আমরা নদীর কত রূপই না দেখি। পাহাড়ের বুক চিরে খর স্রোতস্বিনী, যত শীর্ণই হোক, নেমে আসে তীব্র গতিতে কোনও বাধা না মেনে। মুক্তির উল্লাসে সফেন ঝর্নাধারা আছড়ে পড়ে উপলখন্ডে। বিচ্ছুরিত অসংখ্য জলবিন্দুর উদ্গীরণে সৃষ্টি হয় এক মোহময় জালিকা। যার বুকে জেগে ওঠে সূর্যের সাতটি রং। উৎস থেকে নির্গমনের পথে দ্রুতলয়ে উর্বশীর নৃত্যছন্দে অনুরণিত হয় প্রাণোচ্ছল সংগীত। এমনি করে নদী যখন নেমে আসে সমতলে, তখন তার ভরা যৌবন। কুল ছাপানো অতীব্র গতিতে সৃষ্টি করে চলে জনপদ, জীবন প্রণালী আর কত কত কাহিনি। পরিশেষে সাগরের কাছে আত্মসমর্পণের সময় থাকে শুধু মিলনের গতিটুকু। ভাবগাম্ভীর্যময় এই সমর্পণের ক্ষণে কি ফেলে আসা সুদীর্ঘ পথের দিকে ফিরে তাকানোর বাসনা জাগে নদীর?

আজ আমি বারবার ফিরে তাকাই আমার ঝড়বাদলে আম কুড়ানোর দিনগুলিতে, আতস কাচের চোঙে চোখ রেখে বায়স্কোপ দেখে উল্লসিত হয়ে ওঠার জীবনে, বেসামাল ভোকাট্টা ঘুড়ির পেছন পেছন ছোটার মাঠেঘাটে কিংবা ছুট্টে গিয়ে রেললাইনের পাশে টেলিগ্রাফের খুঁটিতে কান পাতার বয়সে। এই ফিরে ফিরে দেখা মানুষের অতি সাধারণ, সহজাত এবং চিরন্তন প্রবৃত্তি। আমাদের কৈশোরের বাড়ি-ঘরদোর, পাড়া, মাঠঘাট, নদীনালা, জলাশয়, ঝোপঝাড়, প্রায়শই যেখানে যেখানে আমরা বিচরণ করতাম, আমাদের আকর্ষণ করত, তার কথা স্মরণ না করে থাকতে পারি না।

আমাদের পাড়া দশ বারোটি পরিবারের বাসস্থান। সামনে পেছনে দুটি পুকুর। সামনের পুকুর পাড়ে ছোটদের খেলার মাঠ, তার পাশে চার পাঁচ বিঘে চাষের জমি, যেখানে আমন ধানের চাষ হতো। পেছন দিকে আরও একটি পুকুর, যার চারদিকে ছিল বড় বড় গাছপালা, ঝোপঝাড় নিয়ে বিস্তীর্ণ এক জঙ্গল। দলবদ্ধভাবে এখানে ঘুরে আমরা বনভ্রমণের শখ মেটাতাম। একা একা সাহস হতো না। বিষধর সাপ ছাড়াও কাল্পনিক প্রতিপক্ষের ভয়ই ছিল বেশি। কেমন গা ছমছম করত। পুব দিকে পুকুর পাড়ের খেলার মাঠের পরেই ছিল একটি বড় খাল, তার ওপারে সদর হাসপাতাল। পাড়ার উত্তর দিকেও ছিল একটা ছোট খাল যা বড় খালের সঙ্গে গিয়ে মিশেছিল।

শৈশবের স্বর্গ এই পাড়াটাকে দেশ বলে বিকেলেই আমরা বেরিয়ে পড়লাম। বড়খালের ওপর একটা লোহার সেতু পেরিয়ে ডান দিকে ছিল আমাদের পাড়ায় যাওয়ার একমাত্র রাস্তা, যার বাঁ দিকে ছিল ধানের জমিটি। একটু এগিয়ে ধানজমির শেষ প্রান্তে বাঁ দিকে ঘুরে রাস্তাটি পাড়ায় ঢুকে গিয়েছিল ধানজমি আর পুকুরের মাঝ দিয়ে। সেতু পেরিয়েই বাঁ দিকে পুরনো একটি দোতলা বাড়ি এই প্রথম অক্ষত অবস্থায় দেখতে পেলাম। বাড়িটি ছিল ফরিদপুরের একজন প্রখ্যাত উকিল বিনয়বাবুর। পদবী ভুলে গেছি। এত দিনের কথা তো। বাংলাদেশ সরকার এই বাড়িটিকে অধিগ্রহণ করে রাজেন্দ্র কলেজের অধ্যাপকদের জন্য কোয়ার্টার তৈরি করেছে। বাড়ির সামনে একটি সাইনবোর্ড দেখে তাই মনে হলো। তবে সরকারি অধিগ্রহণ হয়েছিল বলেই বাড়িটাকে অবিকৃত অবস্থায় দেখতে পেলাম। হারানো স্মৃতির যে কোনও কিছুকেই এমন করে পেলে কতো ভালই না লাগে। বাড়িটার সামনে পুব দিকে বড় একটা খালি জায়গা তেমনই আছে। তার পরেই ছিল বড় খালের পাড় দিয়ে অনেকগুলো গোঁড়া লেবুর গাছ। লেবুগুলো হতো বেশ বড় বড়। এত বড় লেবু আর কোথাও দেখি নি। কিন্তু ভীষণ টক। অন্য পাড়ার সঙ্গে যেদিন আমাদের ফুটবল খেলার প্রতিযোগিতা থাকত, হাফ টাইমে নুন মেখে খাওয়ার জন্য সেদিন বড় বড় কয়েকটা নিয়ে যেতাম এখান থেকে। কেউ কিছু বলত না এ জন্য। তখনকার দিনে এটাই ছিল দস্তুর। আম জাম লিচু কোনও ক্ষেত্রেই কেউ কোনওদিন আমাদের বারণ করে নি।

লোহার সেতু পেরিয়ে ধন্ধে পড়ে গেলাম। ধান জমি নেই, মাটি ফেলে ভরাট করে সেখানে অজস্র বাড়ি উঠেছে। বাড়ির ভিড়ে পাড়াটাই হারিয়ে গেছে। একটির জায়গায় দুটো রাস্তা হয়ে গেছে। কোনটা ধরে গেলে যে পুকুর পাড়ে আমাদের পুরনো বাড়িটা দেখতে পাব, বুঝতে পারছিলাম না। রেবাকে বললাম, খালের পাড়ের রাস্তা দিয়েই যাই। কিন্তু এই রাস্তারও দু-দিকে বাড়ি, যেখানে আগে কিছুই ছিল না। যেতে যেতে ডান দিকে লক্ষ রাখছিলাম সদর হাসপাতাল দেখা যায় কিনা, কারণ খালের ওপারেও কিছু কিছু বাড়ি হয়ে গিয়েছে বলে হাসপাতাল একটু আড়ালে চলে গেছে। তাছাড়া আগেই শুনেছিলাম, ছোট খাল বুজিয়ে ফেলে রাস্তা অনেকটা চওড়া করা হয়েছে এবং খালের অপর পাড়েও, যেখানে আম জাম নারকেলের ফাঁকা একটা বাগান ছিল, সেখানে অনেক নতুন বাড়িঘর তৈরি হয়েছে। ফলে জায়গাটা একটু অচেনা গোছেরই হয়ে গেছে। ছোট খালের উপর একটা কাঠের সেতু ছিল বড়

খালের সঙ্গম স্থলে, তারপরেই একটা বড় পরিত্যক্ত টালির ঘর, যার চারদিকে চওড়া বারান্দা ছিল। ছেলেবেলায় মাঝে মাঝে এখানে আমাদের নাটকের রিহার্সাল হতো। ছোট খাল নেই, কাঠের সেতুটি নেই, নেই সেই বাড়িটাও। দুজন ভদ্রলোককে দেখলাম আমাদের দিকে উৎসুক ভাবে কী সব বলাবলি করছেন। একজনের মাথায় টুপি, গালে দাড়ি। উনিই আমাকে জিজ্ঞেস করলেন,

–কোন বাড়ি খুঁজছেন নাকি?

এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে পাল্টা প্রশ্ন করলাম,

–আচ্ছা, ওইখানে সদর হাসপাতাল আছিল না?

খালের ওপাড়ের দিকে দেখিয়ে ভদ্রলোক বললেন,

–ওই তো হাসপাতাল।

নতুন বাড়িগুলোর ফাঁক দিয়ে একবার হাসপাতাল দেখতে পেলাম। বললাম,

–তাইলে এই সোজাই আছিল আমাগো বাড়ি। পুকুর পাড়ে।

–কোন বাড়ি?

–আমার বাবার নাম আছিল মনোমোহন রায়।

–ও, মোক্তার বাবুর ছেলে আপনি। ওই যে পুকুর পাড়ে বাড়িটা দ্যাখতেছেন, ওই জাগায় আছিল আপনাগো পুরনো বাড়ি। হেই বাড়ি এহন আর নাই, নতুন বাড়ি অইয়্যা গ্যাছে সেহানে। সব কিছু বদলাইযা গেছে এদ্দিনে। আপনি এহন আছেন কোথায়?

–কইলকাতায়। আমাগো পাড়া দ্যাখতে আইলাম, তো, আমাগো পুরানো বাড়িটাই নাই।

–হেই পুরানা বাড়িটা নাই তো কী অইছে, যান না আপনাগো আগের বাড়ির জায়গাটাই দেইখ্যা আসেন। তাও খুব ভাল লাগলো, এদ্দিন পরে অইলেও দ্যাখতে আইছেন। দ্যাশের টান তো।

ভদ্রলোকের কথায় এতক্ষণে পুকুরটা দেখতে পেলাম। রেবাকে দেখালাম আমাদের বাড়ি কোথায় ছিল। এত বড় পুকুর ছিল, অনেক দুর ধেকে খুব ভাল করেই দেখা যেত। বড়খালের ওপর লোহার সেতু পেরিয়ে বিনয়বাবুর বাড়ির কাছ থেকেই পুকুর, আমাদের বাড়ি, আমাদের পাড়াটাই দেখা যেত, কারণ দৃষ্টিপথে কোনও অন্তরায়ই ছিল না। আর এখন বাড়িঘর এবং গাছপারার ভিড়ে আমাদের বাড়ি একদাম ঢাকা পড়ে গেছে। পুকুরে জলও তেমন নেই, ঝোপজঙ্গল আগাছায় ভর্তি কেমন সঙ্কীর্ণ হয়ে গেছে। আমাদের সময় পুকুরটা কী সুন্দরই না ছিল। বর্ষাকালে প্রায় প্রতি বছরই বন্যা হতো আর আমাদের পাড়াসুদ্ধ পুকুর চলে যেত জলের তলায়। সীমানা হারিয়ে যেত পুকুরের। সেই জলে আমি খুব সাঁতার কাটতাম। কোনওরকম বিরতি না দিয়ে একটানা পনেরো ষোলবার পুকুর পারাপার করতাম। আমাদের পাশের বাড়িতে একজন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট থাকতেন, মণীন্দ্র কিশোর তলাপাত্র। তাঁর বারান্দা থেকে সব দেখা যেত। উনি সেখানে একটা আরাম কেদারায় বসে আমার সাঁতার কাটা দেখতেন। আমার একক্ষণ ধরে সাঁতার কাটা দেখে খুশি হতে আমাকে ব্রজেন দাস বলে ডাকতেন ইংলিশ চ্যানেল জয়ী প্রথম বাঙালির নামানুসারে। জলের গভীরতা বেড়ে যাওয়ায় পুকুরের শাপলাগুলো দশ বারো ফুট লম্বা হয়ে যেত। রান্না করার ইচ্ছে হলে মা আমাকে তুলে আনতে বলতেন। আমি সাঁতারে সাঁতরে তুলে আনতাম। কয়েকটা তুললেই অনেক হয়ে যেত। আবার গ্রীষ্মের সময় জল যখন অনেক কমে যেত, আমরা কুচোবাচ্চারা দলবেঁধে ঝাপাঝাঁপি করে সেই জল রীতিমত ঘোলা করে ফেলতাম। বয়স্করা স্নান করতে পুকুর ঘাটে এলে একটু বকাবকি শুনতাম। দীর্ঘক্ষণ ঝাঁপাঝাপি করার ফলে চিবুকে পলির প্রলেপ পড়ে যেত পুরু হয়ে। পরস্পর পরস্পরকে চোখ দেখিয়ে জানতে চাইতাম কতটা লাল হয়েছে। অতিরিক্ত হয়ে গেলেই একটু ঘাবড়ে টাবড়ে জল থেকে উঠে আসতাম। তার আগে নয়। মায়েদের ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকিকে বিশেষ গুরুত্ব দিতে চাইতাম না। পুকুরটাকে এত ভালবাসতাম যে এর কল্যানেই ছেলেবেলায় বার কয়েক নিয়োমোনিয়া আর টাইফয়েডে ভুগেছি। কলকাতা থেকে অ্যান্টিবায়োটিক না গেলে কী যে হতো, জানি না। আবার এই পুকুরের জলই এক সময় ডালিম রসের মতো পরিষ্কার হয়ে গেছিল। অন্তত দুবছরের জন্য। আইয়ুব খান পাকিস্তানের রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করেই সারা দেশে সামরিক শাসন জারি করে দিলেন। করেই নানা রকম ফতোয়া জানির করতে থাকেন। একটি ফতোয়ায় সমস্ত পুকুরের কাপড় কাচা বাসন মাজা স্নান করা নিষিদ্ধ করা হলো। আমাদের পাড়ার সবাই পুকুর থেকে জল তুলে ওপরে যা কিছু করার করতে শুরু করলেন। আমর আমরা সজাগ দৃষ্টিতে নজর রাখতাম, বহিরাগত কেউ পুকুরে স্নান করেত নামে কিনা। কদাচিৎ কাউকে নামতে দেখলেই আমরা হইচই করে তুলে দিতাম। বছরকয়েক এরকম চলেছিল আর সে সময় পুকুরের জল এত পরিষ্কার থাকত যে জলের তিনচার ফুট নীচের মাছগুলোকে আমরা স্পষ্ট দেখতে পেতাম।

ধার দিয়ে কত শাপলাফুল ফুটে থাকত। কয়েকটা হাঁস ডুবে ডুবে ছোট ছোট শামুক গুগলি খেত। পেট ভরে গেলে একসাথে অলস গতিতে সাঁতার কাটত। তারপর একসময় পাড়ে উঠে পেছনের পালকে ঠোঁট গুঁজে বিশ্রাম নিত। কখনও শুখু এক পায়ে দাঁড়িয়ে। পাড়েবসে কখনো উদাসী সময় কাটাতাম আর তখন উদ্দেশ্যহীন ভাবে ছোট্ট

একটা ঢিল ছুঁড়ে দিলে দেখতাম ছোট ছোট ঢেউ বৃত্তাকারে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ছে মৃদু সংগীতের মতো, তারপর একসময় মিলিয়ে যেত। আজ আমার সেই প্রিয় পুকুরের এই পরিণতি দেখে ভীষণভাবে আহত হলাম। অনুভব করলাম বুকের খাঁচার ভেতর থেকে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাসের স্বরোৎসারিত নিঃসর।

-কী অইল? যান, দেইখ্যা আসেন।

সম্বিত ফিরে পেলাম ভদ্রলোকের কথায়। বললাম

-হ, ঠিকই কইছেন। যাই দেইখ্যা আসি। এদ্দিনে পুরানো বাড়ি তো থাকবই না। তাই বইল্যা পুরানা জাগাটা দেহুম না কেন? ওইহানে গ্যালে কত পুরানা কথাও তো মনে পড়বে?

এতক্ষণে দ্বিতীয় ভদ্রলোক কথা বললেন,

-আইচ্ছ্যা, পুরানো কাউকে দ্যাখলে আপনি চিনতে পারবেন?

-পুরানো করা কথা ক-ন?

-আপনাগো পাশের পাড়ায় মিহির আছিল, মনে পড়ে?

-হ্যাঁ

-এহন দ্যাখলে চিনতে পারবেন?

আমাদের পাশের পাড়াকে বলা হতো বাওন পাড়া (ব্রাহ্মণ পাড়া) পাঁচ ছয় ঘর ব্রাহ্মন পরিবারের বাস ছিল বলে। মিহিরের কথা শোনামাত্র বিস্মৃত কতো ঘটনা একসাথে স্মৃতির পর্দায় ভেসে উঠল। বললাম,

-মিহিরের দ্যাখলে অবশ্যই চিনতে পারুম।

-চলেন, তাইলে আপনাগো নিয়্যা যাই। আমি মিহিরের ছোট ভাই। আমার নাম রবি।

রবির নাম মনে পড়ে গেল, যদিও এতক্ষণ ওকে দেখে চিনতে পারি নি। চেনার কথাও নয়। কারণ ও এত ছোট ছিল যে খেলাধুলায় ও কখনও আমাদের মতো বড়দের সাথে থাকত না। কিন্তু নিজের নাম বলায় চিনে ফেললাম। বিস্মিত হয়ে বললাম,

-ও, তুমি রবি। তোমারে চিনতে পারি নাই বইল্যা কিছু মনে কইরো না। এতকাল পরে তোমারে দ্যাখলাম তো, তাই। তাছাড়া, এত বড় অবস্থায় দেখি নাই তোমারে। চল, নিয়্যা চল তোমাগো বাড়ি।

রবি আমাদের নিয়ে চলল। আগের ভদ্রলোক বললেন,

-হ, যান দেইখ্যা আসেন ভাল লাগবো। সামনের এই বাড়িটা আমাগো। ঘুইর‍্যা আইসেন আমাগো বাড়ি।

আমাদের রিহার্সেলের বাড়ির জায়গায় দেখলাম একটি নতুন সুরম্য বাড়ি। ওই বাড়িটা দেখিয়েই ভদ্রলোক একথা বললেন। এই আমন্ত্রণের জন্য ভাল লাগল, যদিও সময়াভাবে যেতে পারি নি।

রবির সাথে যেতে যেতে আমাদের বাড়ি যেখানে ছিল, সেখানে নতুন তৈরি বাড়িটার সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। বড় একটা উঠোনকে ঘিরে চার দিকে বড় বড় চারটি ঘর নিয়ে ছিল আমাদের বাড়ি, সে জায়গায় ছোট ছোট স্বল্প পরিসরের বাড়ি হয়েছে আলাদা আলাদা। রবি বলেছিল একবার ভিতরে ঢুকে দেখতে। কিন্তু এতটা পরিবর্তনের পর কোনও কিছুই মিলবে না, কোনও কিছুই পাব না। তাই ইচ্ছে করল না। ঢুকতে। তার চাইতে স্মৃতির মণিকোঠায় আমার প্রাণময় পুরনো বাড়িটাই বেঁচে থাকুক।

ভিতরে না ঢুকে বাইরে ঘরের পাশে পথেই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে রেবাকে বুঝিয়ে বলছিলাম এই ঘরের আশেপাশে কোথায় কী ছিল, কোথায় বলার মতো কী ঘটেছিল, যাকে বলে স্মৃতিচারণা। প্রত্যেক স্মৃতিচারণার কেন্দ্রবিন্দু তো সেখানেই, যেখানে আমরা মায়ের কোল থেকে নেমে হামাগুড়ি দিতে দিতে টলোমলো পায়ে উঠে দাঁড়াই। তারপর একটু একটু করে পৃথিবীর দরবারে উঁকিঝুকি মারতে শুরু করি। কেন্দ্রবিন্দু তো সেখানেই, যেখানে শৈশব কৈশোর যৌবনের সড়ক ক্রমান্বয়ে পেছনে যেতে থাকে। কেন্দ্রবিন্দু তো সেখানেই, যেখানে দিনে দিনে পৃথিবীর রূপ রস গন্ধ পরিবর্তিত হতে হতে আমরা একদিন নতুন পৃথিবীতে উপনীত হই। তারপর অনেক দিন পার হয়ে গেলে হয়তো কোনও এক জীবনসন্ধ্যায় আমাদের ফেলে আসা পদচিহ্নের জাদুঘরে অনুসন্ধানে মগ্ন হই।

আমরা সাদা রঙের যে পাকা ঘরটির পাশে দাঁড়িয়ে আছি, ঠিক সেখানেই ছিল আমার পড়া-থাকা-ভাবনার ঘর। ঘরের মেঝে পাকা, বেড়া টিনের, চাল টালির। টালির নীচে দরমার সিলিং। ঘরটির নামকরণ হয়েছিল টালির ঘর। টালির ঘরে বাড়ির ভিতর দিকে একটি বড় পড়ার টেবিল, দুটো চেয়ার আর একটি বইয়ের আলমারি। পড়তে বসতাম পথের পাশের বাইরের দরজার কাছে। এখান থেকে দুরের হাসপাতাল অবধি দেখা যেত। সত্তর আশি ফুট দুরে একটা ল্যাম্প পোস্ট ছিল আর তার নীচে একটু পাশেই ছিল কলাগাছের একটা ঝাড়। হাওয়ায় পতপত করে নড়ত কলাগাছের পাতাগুলো। রাতে পড়তে বসে প্রায়ই ল্যাম্প পোস্টের নীচে ভূতপ্রেতের নৃত্য দেখতাম। খুব একটা ভীতু ছিলাম না। তবে প্রথম প্রথম গা ছমছম করে উঠত, লোমকূপে উত্তেজনা অনুভব করতাম। তখন নিজের ভয় ভাঙানোর ব্যবস্থা নিজেই করতাম। পড়ার টেবিল ছেড়ে রাস্তায় নেমে অতি সন্তর্পণে গুটিগুটি কাছে গিয়ে কলাগাছকে সনাক্ত করে নিশ্চিন্ত হতাম। ঘটনাটি প্রায়ই ঘটত, অথচ কী আশ্চর্য, প্রতিবারই

মনে হয়েছে এবার আর কলাপাতার কাঁপন নয়, নিশ্চয়ই পেত্নীর ঘোমটা বা আঁচল হাওয়ার আন্দোলিত হচ্ছে। কিন্তু প্রতিবারই ধারণাটি ভুল প্রমাণিত হয়েছে। একবারের জন্যও ওদের দেখা পাই নি।

টালির ঘরের পাশে রাস্তা জুড়ে ছিল অতি প্রাচীন এক বোম্বাই আমগাছ। আম খুব মিষ্টি হলে কী হবে, গাছের গুড়ি এতো মোটা ছিল যে সেটির দুদিকেই পায়ে চলার পথ এতো সঙ্কীর্ণ ছিল যে, কোনও দিক দিয়েই একজনের বেশি হাঁটা যেত না। সম্ভবত তখন সপ্তম শ্রেণিতে পড়ি, বয়ঃসন্ধিকালের নিয়মে অনেকদিনের স্থিতাবস্থা থেকে হঠাৎ দৈর্ঘ্যপ্রাপ্তি ঘটছে। ফলে চেহারায় রুগ্নতার দৈন্য রীতিমত চোখের পড়ার মতো। এসময় বসন্ত রোগে আক্রান্ত হলাম এবং পুরো একমাস ভুগলাম। ফলে এই দীনতা সীমাহীন পর্যায়ে চলে গেল। তখন আমার মাথায় চুল ছিল খুব ঝাঁকড়া। দীর্ঘ একমাসে চুলের দৈর্ঘ বেড়েছে, তেমনি তেল সাবানের সম্পর্কহীনতায় সেই চুল প্রায় দেবাদিদেবের অলংকারে উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। আর সেই সুযোগে কোটিখানেক কেশকীট তাদের ছানাপোনা বিম্ব নিয়ে আমার জটাজঙ্গলে অতি জটিল অবস্থা বাঁধিয়ে বসেছে। সংস্কারের কোনও সম্ভাবনা নেই দেখে সহৃদয় ক্ষৌরকর্ম একেবারে চেচেপুঁছে আমাকে দিল পুরোপুরি ভারমুক্ত করে। এবার বুঝুন আমার চেহারার কী বাহার। দিনের বেলাতেই কেউ দেখলে চমকে ওঠে। আর যদি হয় রাত্রিবেলা? আমার ঘরের পাশের পথ দিয়ে খুব লম্বা চওড়া হৃষ্টপুষ্ট এক জোয়ান যুবক প্রতিদিনই যাতায়াত করত। সেদিন সন্ধে গড়িয়ে সবে আটটা সাড়ে আটটা হবে, রাস্তায় কোনও কারণে তখন আলো নেই। জানালা দরজা দিয়ে হারিকেনের যেটুকু আলো আসছিল, কোনও রকমে তাতেই যা একটু দেখা যায়। প্রকৃতির ডাকে আমগাছটির পিছনে গিয়েছিলাম, উঠে আসতে গিয়ে গাছের পেছনে পড়ে গেছি। গাছের আড়াল থেকে মুখ বাড়াতেই দেখলাম সেই যুবকটি আধো অন্ধকারে আমাকে দেখেই হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। ভাবলাম অন্ধকারে আমার আবছা উত্তমাঙ্গ দেখে আধিভৌতিকভীতিতে আক্রান্ত হয়ে পড়েছে। আর যাতে ভয় না পায় সেই সদুদ্দেশ্যেই তৎক্ষণাৎ আমি আবার গাছের আড়ালে চলে গেলাম। উদ্দেশ্য যত সৎই হোক, মুহূর্তের এই সিদ্ধান্ত ছিল মারাত্মক রকমে এক ভুল। তখন আমি নিজেই বুঝতে পারলাম, এরকম আত্মগোপনের চাইতে আত্মপ্রকাশ করাই যুবকটির পক্ষে অধিক নিরাপদ এবং মঙ্গলজনক। এরকম চিন্তা করে, কয়েক মুহূর্ত পরে যেই না আমি আড়াল থেকে বেরিয়েছি, ওরে বাপরে বাপ, সে কী কান্ড। ই...রে আল্লারে... বলে এক আর্ত চীৎকার তিন লাফে আমার ঘরের দরজা দিয়ে ঢুকে দড়াম করে সাষ্টাঙ্গে সেই যে উপুড় হলো, তারপর তাকে ধাতস্থ করতে বাড়িসুদ্ধ লোকের ছোটাছুটি আর গ্লাসের পর গ্লাস জল আনা।

বিনয়বাবুর বাড়ির মতো আরও একটি বাড়ি সম্পূর্ণ অক্ষত অবস্থায় পেয়ে গেলাম। খালের অপর পাড়ে প্রায় আমাদের টালির ঘরের সোজাসুজি দোতলা বাড়িটি সেই রকমই আছে। সামনে সুন্দর একটি বারান্দা। বেশ উঁচু। একটা বনেদি পরিবারের বাসস্থল ছিল এটি। আমার জ্ঞান হবার পর বেশি দিন ওরা থাকে নি। একদিন দেখলাম বাড়িটি পরিত্যক্ত হয়ে গেল। খেলতে খেলতে তখন আমরা জলশূন্য বাড়ির ভিতর প্রবেশ করতাম। পরে সম্ভবত এটা সরকারি আবাস হয়ে যায়, কারণ পরপর বেশ কয়েকজন পুলিশ অফিসারকে এই বাড়িতে সপরিবারে বসবাস করতে দেখেছি। একজন অফিসারের কথা মনে আছে। যার এগারো বারো বছরের একটি ছেলে ছিল। আর ছিল কালচে লাল রঙের খুব সুন্দর একটি ঘোড়া, যেমনটি পরবর্তীকালে দেখেছি কলকাতা মাউন্টেড পুলিশের। এতবড় ঘোড়া ইতিপূর্বে কখনও দেখি নি। লোকের বলাবলি থেকে জেনেছিলাম এটা নাকি আরবি ঘোড়। লোমে ঢাকা শরীর তেল চুকচুক করত। দূরত্ব রেখে দেখতাম, ভয়ে খুব কাছে যেতাম না। কিন্তু ওই পুচকে ছেলেটি যেত। যেত মানে, একদম পিঠে আসীন হয়ে যেত। ছোট বলে রেকাবে পা দিয়ে অত উঁচু ঘোড়ায় উঠতে পারত না। তাই ঘোড়াটিকে সেই উঁচু বারান্দার পাশে নিয়ে আসত এবং সেখান থেকেই ঘোড়ার পিঠে চাপত। আমার মনে হতো, এদের দুজনের মধ্যে বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। ছেলেটিকে পিঠে নিয়ে ঘোড়া যখন কদমে ছুটত, দারুণ লাগত দেখতে। ছেলেটি প্রায় শুয়ে পড়তে পিঠের উপর। প্রায় প্রতিদিনই ওরা এরকম ছুটত।

বন্যার সময় আমাদের পাড়ার সব বাড়িই জলমগ্ন হতে যেত। সেসময় আমাদের সব ঘরের সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থা করা হত বাঁশের সাঁকো মারফত। টালির ঘরের মেঝে প্রায় জল ছুঁইছুঁই হয়ে যেত। আর দু-এক ইঞ্চি বাড়লেই জল ঘরে ঢুকে যেত। কিন্তু কোনও বছরই তেমন হয় নি। স্কুল কলেজ বন্ধ হয়ে যেত কিন্তু অফিস কাছারি খোলা থাকত। তাই ছোটরা গৃহবন্দি হলেও বাবা কাকুদের বাইরে বেরুতেই হতো। হাট বাজারের জন্যও যেতে হতো। কিন্তু বাওন পাড়া আর আমাদের পাড়া স্থলপথে মূল শহর থেকে একদম বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত। কারণ কোথাও কোমর সমান আবার কোথাও তার চাইতে বেশি জল। আবার রেল লাইনের ওপারের গ্রাম থেকেও প্রতিদিন প্রচুর লোককে শহরে আসতে হতো। সেদিকে তো জল আরও বেশি। তাই তখন নৌকোই একমাত্র ভরসা। গ্রাম থেকে অনেকে তাদের নৌকো নিয়ে আসত খেয়া পারাপারের জন্য। বেশ কিছু রোজগারও হয়ে যেত তাদের। জলবন্দি হয়ে আমরা ছোটরা সাঁকো পারাপার করে এঘর ওঘর করতাম আর নিজেদর মতো করে খেলাধুলো এবং বিনোদনের ব্যবস্থা করতাম। মামাতো পিসতুতো অনেকগুলো ভাইবোন ছিলাম আমরা এই বাড়িতে। তাই আমাদের কোনও

রকমের একঘেয়ামি স্পর্শ করতে পারত না। মাঝে মাঝে জানলা দিয়ে জলে ছিপ ফেলতাম। কিন্তু বানভাসি জলের মাছ মোটে কোথাও থিতু হতো না, চর্তুদিকে ছড়িয়ে পড়ত আর তাছাড়া কেঁচোদের গণমরণে খাদ্যখানারও বোধ হয় অভাব হতো না, বড়শির আধার অভুক্তই থেকে যেত। কদাচিৎ দু-একটা কী করে যেন জুটে যেত।

মনে আছে, কোনও এক পূর্ণিমার রাতে বাবা আমাকে নিয়ে নৌকো ভ্রমণে গিয়েছিলেন। বাওন পাড়ায় একজন পুলিশ কর্মচারী ছিলেন। নাম সুনীল, পদবী ভুলে গেছি। আমরা সবাই সুনীল পুলিশ বলতাম। বাবা মাঝিকে প্রথমে সেই সুনীল পুলিশের বাড়ি নিয়ে যেতে বললেন। সুনীল পুলিশ একটা গ্রামোফোন যন্ত্র আর অনেকগুলো রেকর্ড নিয়ে নৌকোয় উঠলেন। কলের গান শুনতে শুনতে জ্যোৎস্না রাতের সেই প্রমোদ বিহার আমরা তিনজন প্রাণভরে উপভোগ করেছিলাম।

স্মৃতিচারণায় এমনই কত ভেলা যে আমার চিত্তাকাশে শরতের মেঘের মতো ভেসে বেড়াচ্ছিল, তার কটি থেকে আর বারিবর্ষণ সম্ভব? নাকি কখনও তাই হয়? তার অধিকাংশই তো অব্যক্ত থেকে যায়। সবারই। ব্যক্ত হওয়ার জন্য যারা ভিড় করে আসছিল, তারই দু-চারটি বলছিলাম রেবাকে আমার ফেলে আসা বাসভূমির দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে। তারপর রবিকে নিয়ে চললাম মিহিরের সাথে দেখা করতে। বোজানো হয়ে গেছে বলে আমাদের খাল পেরুনোর ধকল নিতে হলো না। অলিগলি পেরিয়ে পৌঁছে গেলাম মিহিরদের বাড়ি। ও বাড়িতেই ছিল। রবি আমাকে দেখিয়ে দাদাকে জিজ্ঞেস করল,

-দ্যাখো তো এনাকে চিনতে পার নাকি?

না, মিহির কিংবা আমার কারুরই কাউকে চিনতে কোনও অসুবিধা হলো না। দীর্ঘ সাতচল্লিশ বছর পর দুই বৃদ্ধের দেখা, ভাবাবেগ কেউ রোধ করতে পারছিলাম না। উল্লাসের আতিশয্যে দুজন দুজনকে জড়িয়ে ধরলাম। মিহিরের স্ত্রী ছাড়া আরও কয়েকজনকে দেখলাম, যাদের কাউকেই আমি চিনি না। আমাকেও কেউ চেনেন না। শুদু আমাদের পরিচয় শুনেই সবাই বুঝতে পারলেন আমরা অত্যন্ত কাছাকাছি ছিলাম, যার জন্য আমরা গভীরতম আত্মীয়তা অনুভব করছি, অনাস্বাদিত নৈকট্যের প্রবাহ বয়ে চলেছে আমাদের সবার মধ্যে। মনে হচ্ছিল সবাই আমরা খুব কাছেরজনকে পেয়েছি।

ওদের বাড়ির সীমানা ছিল অনেক বড়। সামনের দিকে গাছগাছালির ছায়ার ঘেরা খোলামেলা বেশ খানিকটা জায়গা ছিল এবং তারপরেই ছিল বড় একটা খেলার মাঠ। বছরভর এখানেই আমরা ফুটবল ক্রিকেট খেলতাম। অন্য পাড়ার সঙ্গে প্রতিযোগিতামুলক খেলাগুলো এখানেই হতো। সেসব কিছুই আর এখন নেই। গায়ে গায়ে বাড়ি উঠেছে। ওদের বাড়িটা অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ পরিধির মধ্যে চলে এসেছে। আগে যেখানে অধিকাংশই হিন্দু পরিবারের আবাস ছিল সেখানে এত এত বাড়ির মধ্যে মাত্র ওদের পরিবারই হিন্দু আছে। পাশে আমাদের পাড়াতেও সবই হিন্দু পরিবার ছিল। যেখানে এখন এক ঘরও হিন্দু নেই। অর্থাৎ পুরনো আর কেউ নেই। কে জানে, হয়তো সে কারণেই ওদের কেমন ম্রিয়মান দেখাচ্ছে। সবার মধ্যে হারিয়ে যাওয়া পুরনো অবস্থাকে, পুরনো পরিবেশকে আঁকড়ে থাকার এক স্বাভাবিক প্রবৃত্তি ও আকাঙ্ক্ষা থাকেই। তাবলে সময়কে তো অস্বীকার করা যায় না। সময় যে গতিশীল। তবু গতিময় বাস্তবতাকে মান্যতা দিয়ে হলেও পুরনোর প্রতি একটা হাহাকার কি আমরা উপেক্ষা করতে পারি? নইলে সীমানার শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে বারবার কেন আমাদের মধ্যে শৈশবের জন্য এত কাতরতা অনুভূত হয়। হয়তো মিহিরদের মনে বাসা বেঁধে আছে সেই রকমই কোনও বেদনা। অতীত স্মৃতি তো মুছে যাবার নয়। হয়তো সে করণেই আমার এমন মনে হলো। যেহেতু দুরত্ব নৈকট্যের আগ্রহকে উসকে দেয়, বহুদুর সময় সমুদ্র পেরিয়ে আজকের এই মিলনে আমরা পরস্পর পরস্পরকে আপ্লুত করছিলাম সেই নৈকট্যের তাগিদেই।

পুজোর পরপরই গেছি, তাই নারকেলের নাড়ু খেলাম। মনে পড়ে গেল ওদের বাড়িতে অনেক নারকেল গাছ ছিল, যার তলা থেকে এক্কাদোক্কা কানামাছিরা যেন আজও আমাকে হাতছানি দেয়। যার ছায়ায় আজও যেন কোনও দিদির দেয়া কাসুন্দিমাখা কাঁচা আমের স্বাদ পাই। নাড়ু খেতে গিয়ে ক্ষনিকের জন্য হলেও একটু যেন বেসামাল। নাড়ু এতগুলো দিয়েছিল যে আমাদের পক্ষে সব খাওয়া সম্ভব ছিল না। অথচ খেতে খুব ভাল লাগছিল। অগত্যা ওদের অনুরোধ এবং ততোধিক আমাদের গোপন ইচ্ছেয় বাদবাকি সব ছাঁদা বেঁধে নিয়ে এলাম। রাতে ওদের বাড়িতেই খেয়ে যেতে বলেছিল। কিন্তু যেহেতু ঠিক করে রেখেছিলাম সন্ধের পর আমার প্রিয় বন্ধু রামুর বাড়ি যাব, তাই সেটা আর করা সম্ভব হলো না।

চলে আসতেই কষ্ট পাচ্ছিলাম। অপ্রত্যাশিত ভাবে হলেও কত বছর বাদে দেখা হয়ে গেল, আর কতই না ভাল লাগল। কিন্তু মাত্র এতটু সময়ের জন্য। কী জানি, জীবনে হয়তো আর কোনোদিন ওদের বাড়ি যাওয়া হবে না। আর কোনোদিন ওদের দেখতে পাব না। ওদের ম্রিয়মানতায় আমার মনে হচ্ছিল আমাদের এই স্বল্পকালীন সাক্ষাতে যেন একটা বদ্ধ ঘরে দীর্ঘকাল বাদে একটা দমকা হাওয়া এসে নিমেষেই মিলিয়ে গিয়ে ঘরটাকে আবার বন্ধ করে দিয়ে গেল।

পাড়ার পিছন দিকটা দেখার জন্য আমরা দুজনে গেলাম। ওইদিকের পুকুর একদম আগের মতোই আছে। কিন্তু লক্ষ্য করলাম তারপরে অনেক পরিবর্তন হয়ে গেছে। আর একটু এগুলেই রেল লাইন। ছেলেবেলায় আমাদের ঘুরে বেড়ানো এবং ছোটাছুটি করে খেলাধুলো করার সীমানা মোটামুটি এই পর্যন্তই ছিল। ডাইনে বাঁয়ে অনেকখানি করে ফাঁকা জায়গা ছিল। এতকাল ধরে এত কিছু পাল্টে গেলেও আশ্চর্যজনকভাবে ডানদিকে কারও হাত পড়েনি। সেই বাবলা শিমুল জাম খেজুরের গাছসহ মালভূমির মতো বিঘে কতক উঁচু জায়গাটি অবিকল আগের মতোই আছে এবং এতটাই, যে মনে হচ্ছিল তক্ষুনি আমরা দলবল নিয়ে ওইখানে গিয়ে মনের আনন্দে ছুটোছুটি করে বেড়াই, প্রাণোচ্ছল শৈশবে চলে যাই। পরিত্যক্ত জনমনিষ্যিহীন গাছপালা সবুজ মাখানো জায়গাটি স্নেহসিক্ত মাতৃক্রোড়ের মতো চির-অপেক্ষায় রয়েছে পরম আদরে আমাদের বুকে তুলে নিতে।

মনে পড়ে গেল, পাশেই অনেক নীচে যে পুকুরটি ছিল, সেখানে আমাদের থেকে একটু দলছুট হয়ে নিত্য নাম্নী একটি মেয়ে একদিন বাঁদরের আক্রমণে ক্ষতবিক্ষত হয়েছিল। ওর আর্ত চিৎকারে আমরা ছুটে এলে বাঁদরটি পালিয়ে যায়। কেন যে এমন ঘটনা ঘটলো, অনেক চেষ্টা করেও তা উদ্ধার করতে পারি নি। নিত্য আমাদের কোনও প্রশ্নেরই উত্তর দেয় নি। তবে আমরা নিশ্চিত ছিলাম, কিছু না কিছু বাঁদরামো নিত্য সেদিন করেছিল রামানুগত প্রাণীটির সাথে।

কিন্তু বাঁদিকের নির্জনতা হরণ করে নিয়েছে একটা স্কুল এবং নববির্মিত কিছু বাড়িঘর। আগে এখান ধান চাষ হতো। বিস্তীর্ণ জমিতে। একদম ফাঁকা। শুধু মাঠের মধ্যে আলের উপর ছিল একটা ছোট সুন্দর হিজল গাছ। গাছটা যে কী তীব্রভাবে আমাকে আকর্ষণ করত, বলে বোঝাতে পারব না। উন্মুক্ত আকাশের নীচে আলো ঝলমল প্রকৃতির বুকে সুবিন্যস্ত ডালপালাগুলি সূর্যের দিকে মেলে ধরে ধ্যানমগ্ন হয়ে থাকা। মাঝেমাঝে গাছের কোনও এক ডালে উঠে বসে একাকী এক অনির্বচনীয় আনন্দসঙ্গীতে বিভোর হয়ে থাকতাম। সময়কে স্তব্ধ করে দিয়ে ডালে বসে চুপচাপ চারদিক দেখতাম। খুব ভাল লাগত। ভাললাগার এই মধুর স্মৃতি, কেন জানি না, এখনও আমার কাছে বারবার ফিরে আসে।

রাস্তা যেখানে রেললাইন অতিক্রম করে গেছে সেখানে ছিল একটা টেলিগ্রাফের খুঁটি। রেলওয়ের। আমরা প্রায়ই এই খুঁটিতে কান পেতে কিছু শোনার চেষ্টা করতাম।শুধু গোঁ গোঁ করে একটা শব্দ শুনতে পেতাম, আর কত দূর থেকে কী সব বার্তা এসে পৌঁছচ্ছে, তার হদিশ করার চেষ্টা করতাম। হদিশ কখনও পাই নি। ভাবতাম দূর দূর দেশের বার্তা কী এত সহজে বুঝে ফেলা সম্ভব? এও আমাদের চিরন্তন এক প্রবৃত্তি, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাহিনীতে যা সুন্দর ধরা পড়েছে সেই কাহিনীই যখন রূপোলি পর্দায় তুলে আনা হলো। সত্যজিৎ রায়ের পথের পাঁচালীতে প্রকৃতপক্ষে অপু দুর্গা তো আমাদের সকলেরই কৈশোর।

এখানেই ছিল খালের ওপর রেলের ছোট একটা ব্রিজ যার তলা দিয়ে বন্যার সময় তীব্র গতিতে জল বেরুতে সগর্জনে। দেখলাম, রেললাইন তুলে ফেলা হলেও ব্রিজটা রয়ে গেছে। আর এগুলাম না। সন্ধে হয়ে আসছে, রামুর বাড়ি যেতে হবে। কিন্তু ছেলেবেলার যাবতীয় স্মৃতি যেন আবদ্ধ হয়ে থাকত রেলের এই ছোট ব্রিজটিকে কেন্দ্র করে। কারণ, প্রায়শই খেলতে খেলতে এখানে চলে আসতাম। কখনও দলবদ্ধভাবে, কখনও একাকী। এখানে একটি স্মৃতির উল্লেখ না করে পারছি না।

জলের দেশের মানুষ, তায় আবার আমার জীবনের ষষ্ঠ এবং সপ্তম বর্ষ পুরোপুরি আমিরাবাদে গ্রামের বাড়িতে কেটেছে, তাছাড়াও বছরে দু-তিনবার সেখানে গিয়ে থাকতাম। ফলে শহরের পাশাপাশি আমি গ্রাম্যজীবনেও অভ্যস্ত হয়ে পড়ি। শহরের ছেলেপিলেরা না পারলেও গ্রামের শিশুরা অল্প বয়সেই সাঁতার কাটা নৌকো চালনায় দক্ষ। অন্তত ছোটখাটো নৌকোর ক্ষেত্রে। আধুনিক কালের মা-বাবারা এসব শুনে, আমি নিশ্চিত, প্রত্যেকেই যারপরনাই আতঙ্কিত হয়ে পড়বেন। সে থাকগে, খুব ছোট থেকে জলে নৌকোয় থেকে থেকে শৈশবেই নৌকোর প্রতি অতিরিক্ত মাত্রায় আসক্ত হয়ে পড়ি। সেই আসক্তি আজও আমাকে পরিত্যাগ করেনি। বড় কোনও জলাশয় হোক বা গঙ্গাই হোক, ছোট একটি নৌকা আর একখানা বৈঠা পেলে এখনও জলে ভেসে পড়ি।

আগেই বলেছি, ফরিদপুরে আমাদের বাড়ির পাশ দিয়ে বয়ে গিয়েছিল ছোট খাল। আর আমার থাকা ও পাড়ার ঘর ছিল এই খালের একদম পাড়ে। অনেক সময় ছোট বড় অনেক নৌকোই আমার সম্মুখে বাঁধা থাকত। একদিন কী কারণে যেন একটি বেশ বড় নৌকো ভিড়েছিল এই ঘাটে। চারপাঁচজন জোয়ান মানুষের প্রয়োজন হতো নৌকোটিকে চালাতে। দুপুরের পাড়ার সব বাবারা যখন অফিস আদালতে চলে যেতেন আর মায়েরা যেতেন একটু বিশ্রাম-ঘুমে, স্কুলে ছুটি থাকলে পাড়ার দশবারো জন ছেলেপিলে এই ঘাটে ছিপ ফেলে মাছ ধরার মজায় মজে যেতাম। তো সেদিন দেখলাম বড় নৌকোটিকে ঘাটে বেঁধে রেখে মাঝিমাল্লারা কোথায় যেন চলে গেছে। কেউ নেই নৌকোটিতে উঠে পড়লাম। তারপরই আমাদের সবার মাথায় ভূত চাপলো নৌকো অভিযানের।

আমার উৎসাহই ছিল সব চাইতে বেশি। সবাইকে বললাম, যে যেমন পারিস নৌকো চালা। আমি হাল ধরব, কোনও ভয় নেই। আমি তখন সপ্তম কী অষ্টম শ্রেণিতে পড়ি। কত আর বয়স হবে। তার ওপর এতবড় নৌকো কোনওদিন চালাই নি। খালও খরস্রোতা। কিন্তু কোনও ভয়ডর না করে সোজা চলে গেলাম পেছনের গলুইতে, হালে। সামনে বড় দুটো দাঁড় ছাড়াও ছিল কয়েকটা বৈঠা আর লগি। সবাই মিলে পালা করে এগুলো ঠিকঠাক ব্যবহার করতে পারলে আমরা উজানেও যেতে পারব বলে প্রত্যয়ী হলাম। পশ্চিম থেকে পুবে বইছে জলের স্রোত। আমরা দশবারোজন মিলে দিলাম দড়িদড়া খুলে। একটু একটু করে স্রোত কেটে কেটে নৌকো এগুতে শুরু করল। আঃ, কী আনন্দ আমাদের, আর সে কী উল্লাস। ক্রমে নৌকোর গতি বাড়তে থাকল। কিন্তু যখন রেলব্রিজের কাছে এসে পৌছলাম, চিন্তায় পড়ে গেলাম, সঙ্কীর্ণ ব্রিজের তলা দিয়ে সশব্দে জলের তীব্র ধারা বইছে, তা অতিক্রম করব কী করে? জানতাম, এসব নৌকোয় দড়িকাছি থাকে। খুঁজেপেতে পেয়ে গেলাম খুব লম্বা এবং মোটা একগাছা কাছি। পরিকল্পনা করে তার এক প্রান্তে সামনের গলুইতে বেঁধে অন্য প্রান্ত ব্রিজের তলা দিয়ে নিয়ে পাঠিয়ে দিলাম ওপারে। সবাইকে নেমে ওপারে যেতে বললাম আর বলে দিলাম সর্বশক্তি দিয়ে সবাই যেন একসাথে ওপারে কাছি ধরে টানে। আর এদিকে আমি নৌকোর হাল ধরে থাকব। শুরু হয়ে গেল শয়তান আর ভাগ্যের কাছি টানাটানি। কতিপয় অকুতোভয় বালখিল্যের সে কী যুদ্ধ জয়ের এক ঐক্যবদ্ধ দৃঢ় সঙ্কল্প, যার কাছে পরিশেষে হার মানল খরস্রোতা জলরাশির তীব্র হুঙ্কার। কী আনন্দ যে পেয়েছিলাম সবাই মিলে। জীবনে যত যুদ্ধ জয় করেছি, সেদিনের সেই ব্রিজ পেরুনো তার মধ্যে অন্যতম।

বলেছিলাম আমাদের সীমানা রেললাইন অবধি। তার ওপারে আমরা বিশেষ যেতাম না। আর লাইনে ওপারে এই খাল বরাবর কখনই আমরা যাই নি। তাই ওপারের সব কিছুই আমাদের আজানা অচেনা। কোথা থেকে আমাদের এই খালে জলের এত ধারা বয়ে যায়, কিছুই আমরা জানতাম না। সেই উৎস সন্ধানে এবার আমরা ধীরে ধীরে এগুতে লাগলাম। এদিকে নগর সভ্যতার কোনও সুফল পৌঁছয় নি। পুরোপুরি গ্রাম। আর গ্রাম্য পরিবেশের সাক্ষ্য হিসেবে সব বাড়িতেই অনেক গাছপালা, গরু বাছুরের আথাল দেখতে দেখতে চলল আমাদের অজানাকে আবিষ্কারের দৃপ্ত অভিযান। তীর থেকে অনেক আমাদের এই ক্রিয়াকান্ কৌতূহলভরে দেখছিলেন।

এমনি করে আধ মাইল কী আর একটু বেশি খাল দিয়ে চলল আমাদের জলযানটি, তারপর খাল শেষ হতেই আচমকা যেন অকুল দরিয়ার উত্তাল বুকে ভেসে গেলাম। পেছনে গ্রামের সরল সীমারেখা আর সম্মুখে ডাইনে বাঁয়ে অথৈ জল আর জল। আর তাতে এখন কোন স্রোত নেই, কিন্তু বেশ বড় বড় ঢেউ। এই ঢেউয়ের অবিরাম স্পন্দন। উঁহু ভয়ের নয়, সেই স্পন্দন পাগলপারা আনন্দের বন্ধনহীন প্রবল উচ্ছ্বাসের। একটি খাঁচার পাখি যদি খাঁচার খিল খোলা পায়, সম্মুখের অন্তহীন মুক্ত আকাশে যেমন করে মুক্তির উন্মাদনায় স্থান কাল পাত্র কোনও কিছুর তোয়াক্কা না করে ঝাঁপিয়ে পড়বে, দীর্ঘদিনের অনভ্যস্ত ডানার ঝটপটানিতে চারদিক মুখর করে তুবলে, তেমনি করে আমরাও উন্মুক্ত জলরাশিতে ঝাঁপিয়ে পড়লাম দাঁড়ের বৈঠার আঘাতে মধুর ছলাৎ ছলাৎ ধ্বনির সঙ্গতে, অনির্দিষ্ট যাত্রার গতিময়তাকে বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়ে। দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে গ্রাম থেকে অনেক দূরে চলে গেলাম। সময়ের দিকে কারুরই ভ্রুক্ষেপ নেই। পালা করে দাঁড় এবং বৈঠা চালাতে চালাতে আমরা রূপকথার কোনও এক সাগরে ভেসে চললাম। এমনি করে কতক্ষণ চলেছিলাম জানি না, চলার আনন্দে কেউ খেয়ালও করিনি। দেড় দু-ঘন্টাতো হবেই। হঠাৎ লক্ষ করলাম বেলা হেলে পড়েছে, এক্ষুনি আমাদের ফিরতে হবে। বুঝতে পারলাম, পাড়ার সব মায়েদের বিশ্রাম-সময় অতিক্রান্ত হয়ে গেছে এবং দুশ্চিন্তায় সবাই আমাদের খোঁজাখুঁজি শুরু করেছেন। নৌকোর মালিকরাই বা কী করছে কে জানে। কিন্তু যত সহজে আমরা এই বিশাল জলধিতে এসে পড়েছিলাম, ফেরাটা অত সহজের নয়। গ্রামের কাছাকাছি এসে আমরা এই জলধি থেকে আমাদের খালের মুখ কী করে খুঁজে বের করব, ভেবে পাচ্ছিলাম না। হাল আমার হাতে, কিন্তু কোন মুখটা যে আমাদের খালের, সেই ভাবনাতে আমরা বেহাল হয়ে পড়লাম। ভাগ্য প্রসন্ন, তাই আন্দাজে যে মুখে নৌকো প্রবেশ করলাম, সেটিই আমাদের ছোট খালের।

ভাবলাম স্রোতের অনুকূলে যেতে বেশি সময় লাগবে না। কিন্তু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করলাম, প্রতিকূলে নৌকোর হাল ধরা যত সহজ, সরু খালে স্রোতের অনুকূলে তত সহজ নয়। কারণ স্রোতের টানে নৌকোর মুখ এদিক ওদিক হয়ে যায়। ভয় হচ্ছিল, রেলের ছোট ব্রিজটা পেরুনোর সময় এদিক ওদিক করে নৌকো ব্রিজের গায়ে ধাক্কা না মারে। সবাইকে সাবধান করে দিলাম যাতে এমন কিছু ঘটতে গেলে হাত দিয়ে ব্রিজের গা থেকে নৌকোর মুখকে ধাক্কার হাত থেকে বাঁচায়। তবে খুব আনন্দিত হলাম নৌকোটিকে অক্ষত অবস্থায় পাকা মাঝি দক্ষতায় ওই উত্তাল জলস্রোতে নির্বিঘ্নে সেতু পেরুনোয় সক্ষম হওয়ায়। আর দু-তিন মিনিটেই আমরা পৌঁছে যাব আমাদের নির্দিষ্ট ঘাটে। কিন্তু নতুন করে আমাদের উৎকন্ঠার বিষয় হলো ফেরার পর মায়েদের কাছ থেকে আমাদের কপালে কী জুটবে, তা নিয়ে। কিন্তু সমস্ত আশঙ্কার নিরসন হলো, যখন দেখলাম উৎকন্ঠিত মায়েরা তাঁদের গুণধর সন্তানদের ফিরে পেয়ে সব কিছু ভুলে তিরস্কারের হালকা প্রলেপ দিয়েই ছেড়ে দিলেন।

ভাগ্যিস, কোন খেয়ালে সেদিনের কিশোর বালখিল্যেরা এমন এক নৌকো অভিযানে মেতে উঠেছিল। জীবনের অপর প্রান্তে এসে সেই অভিযানের স্মৃতি-চারণায় যে কী সুখ তা অন্য কেউ অনুভব করতে পারবে না।

মিহির বলেছিল নিজের বাড়িতেই রামু খুব সুন্দর একটা লক্ষ্মী-নারায়ণের মন্দির করেছে। গিয়ে দেখলাম, প্রচুর খরচা করে মন্দিরটি বানিয়েছে। সত্যি, বাড়ির ভিতর এত সুন্দর এবং এত বড় মন্দির আর কোথাও দেখি নি। কাঁসর ঘন্টা, ঢাক, ঢোল, করতাল, রাম করতাল, হরেক রকমের বাদ্যযন্ত্র তাকে এবং দেয়ালে পরপর সাজিয়ে রাখা আছে। সন্ধ্যারাতি যখন শুরু হলো, তখন মাত্র আটদশজন পুরুষ মহিলা উপস্থিত। ক্রমেই একে একে আরও অনেকে আসতে লাগল এবং এসেই যে যার মতো তাক এবং দেয়াল থেকে একে একে বাদ্যযন্ত্র নিয়ে বাজাতে লাগল। সন্ধ্যারাতি চলল প্রায় ঘন্টাখানেক। যখন শেষ হলো, দেখা গেল পুরো মন্দির জুড়ে ভক্তবৃন্দের ভিড়। পরিশেষে শুরু হলো ভজন। পুরোধায় রামুই। সবাই ওর সঙ্গে গলা মিলিয়ে সে এক জমাট ঐকতান। ব্যবসা করলেও রামুকে দেখলাম ধর্মে-কর্মেই বিভোর হয়ে থাকতে। লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে মন্দিরটা বানিয়েছে। তবে খুব দুঃখ করে বলল,

-মন্দিরটা বানাইতে হিন্দুরাই সব চাইতে বেশি বাধা দিছে।

শুনে খুবই বিস্মিত হলাম। জিজ্ঞেস করলাম,

-সে কী রে, শেষ পর্যন্ত একটা মন্দির বানাতে হিন্দুরাই বাধা দিল। কেন রে?

ও শুধু বলল,

-জিগাইস না, ছাইড়া দে ও সব কথা।

অবাঞ্ছিত কোনও অপ্রিয় ঘটনার অভ্যাস পেলাম। লক্ষ করলাম কথাটি বলার সময় এবং পরেও ওকে কেমন বিষণ্ন দেখাচ্ছিল।

বাজারের শেষ প্রান্তে কুমার নদীর পাড়ে ওদের বাড়ি। নীচে ছিল কাপড়ের দোকান, ফরিদপুরে সব চাইতে বড় কাপড়ের দোকান ছিল এটাই। এছাড়াও ওদের টিনের ব্যবসাও ছিল। বাংলাদেশে টিনের চাহিদা প্রচুর। তাই পরবর্তীকালে ওরা এই ব্যবসাটি শুরু করেছিল। তবে নীচের এই বড় দোকানটি ছিল সম্পূর্ণ কাপড়ের। বাড়িতে ঢুকেই দেখি দোকান নেই, কী সব জিনিসপত্র স্তূপীকৃত অবস্থায় পড়ে রয়েছে সেখানে। আর তারই একপাশে বর পঁয়ত্রিশের এক ব্যক্তি চুপচাপ বসে আছে। রামুর কথা জিজ্ঞেস করতে ও দোতলার সিঁড়ি দেখিয়ে দিল। কোন খবর দিয়ে যাই নি। আচমকা আমাদের দেখে ও বিস্ময়ে হতবাক হয়ে পড়ল। যুগপৎ আনন্দিতও হলো। স্ত্রীকে ডেকে আলাপ করিয়ে দিল। প্রকৃতপক্ষে ওর স্ত্রীকে একদম শিশুবয়স থেকেই চিনি। প্রায়ই দেখতাম বারান্দায় বসে আপনমনে খেলা করতে। কিন্তু আজ আমার বন্ধু-পত্নীর চুলে ঈষৎ সাদার আভাস। কোথা দিয়ে যে এতগুলো দিন চলে গেল। সম্পূর্ণ নিঃশব্দে আমাদের জীবন এমনিভাবে চুরি করে সময়ের কী লাভ? অন্তরালে বসে এমন কী সম্পদ গড়ে তুলছে অনবরত? একি নিছকই তার অলস খেয়ালের তুচ্ছ খেলা? নাকি সময়ের এই নীরব কুন্ঠীলকবৃত্তিই জগতডোড়া এই সৃষ্টিসমুদ্রকে সচল, প্রাণময়, সংগীতময় করে রেখেছে।

ছেলেবেলায় দেখতাম, মাড়োয়ারি পরিবারের মহিলারা যথেষ্ট পর্দানশীন। পরিবারের খুব ঘনিষ্ঠ হলেও বাইরের কারুর সামনেই এদের কখনো আসতে দেখি নি। কিন্তু আজ রামুর স্ত্রীকে লক্ষ্য করলাম বাঙালি পরিবারের মহিলাদের মতোই খুব সহজে এবং স্বচ্ছন্দে আমাদের সঙ্গে গল্পগুজবে মেতে উঠলেন। খুব সুন্দর চা পরিবেশন করলেন।। মাড়োয়ারি বাড়িতে চা হয় অতিরিক্ত পরিমানে ঘন দুধ এবং এলাচ দিয়ে। কলকাতায় রামুর সঙ্গে দীর্ঘদিন থাকার সময় ওর মামাবাড়িতেও এটা লক্ষ করেছি পরবর্তীকালে। পরিশেষে খুব আন্তরিক ভাবে ওদের বাড়িতে আমাদের দুজনকে খেয়ে যেতে বললেন। রামুও চেপে ধরল। মনে পড়ে গেল কলেজে পড়ার সময় দুই বন্ধু একদিন একসাথে অঙ্ক করব বলে ঠিক করেছিলাম। সেই উলপক্ষে মাত্র একদিনই ওদের অন্দরে প্রবেশ করেছিলাম। অন্দরে এলেও একমাত্র ওর মা ছাড়া অন্য কোন মহিলার মুখ দেখি নি. ওর মা আমাদের ঘরে এলেও অনেক বড় ঘোমটা টেনে দূর থেকে কথা বলেছিলেন। রক্ষণশীলতা ওদের ঘরে এতটাই ছিল। সেদিন তিনি সস্নেহে খেয়ে এবং রাতে থেকে যেতে বলেছিলেন। ওর মার সেই অনুরোধ ফেলতে পারি নি। থেকে গিয়েছিলাম এবং অবশ্যই খেয়েওছিলাম। সে রাতে খাওয়ার অভিজ্ঞতা আজও ভুলি নি। মাড়োয়ারি বাড়িতে ব্যতিক্রমী খাওয়া তো। গরম গরম দুপিঠে জবজবে ঘি মাখানো রুটি, সবজি আর আচার। ওদের খাদ্যতালিকায় আচার বাধ্যতামূলক। এজন্য কলকাতা না রাজস্থান কে জানে, কোথা থেকে ওরা প্রচুর পরিমানে নানারকমের আচার ঘরে এনে রাখতেন। সে রাতে দু-তিন রকমের আচার খেয়েছিলাম। য়ার একটি ছিল গোলাপ ফুলের। জীবনে ওই একবারই খেয়েছিলাম। পুরো একটা গোলাপ ফুল। খাওয়ার সময় গোলাপের গন্ধও পেয়েছিলাম। এ অভিজ্ঞতা কি কখনও ভোলা য়ায়?

আজ আবার ওদের বাড়িতে নৈশাহারের আমন্ত্রণ। এবারের আমন্ত্রণ এক প্রজন্ম পরের, সস্ত্রীক রামুর। এতদিনে কুমার নদী দিয়ে অনেক জল বয়ে গেছে। পরিবর্তন হয়েছে বিস্তর। এখন রাত্রে ওরা রুটির পরিবর্তে ভাত খায়। রামু ওর স্ত্রীকে বলল, -উস্ত্যা ডাউল কর। অরবিন্দ আর বৌদির ভাল লাগব।

অত্যন্ত প্রত্যয়ের সাথে রামু কথাটি বলল। প্রস্তাব আমার কাছেও খুব লোভনীয়। দুপুরের খাওয়া যাচ্ছেতাই রকমের খারাপ হয়েছে। আর রেবা তো সারাদিন কিছুই খায়নি দুটো রসগোল্লা ছাড়া। হোটেলের যে অবস্থা দেখছি, তাতে সেখানে রেবাকে নিয়ে যেতে আমি সঙ্কুচিত এবং শঙ্কিত। হয়তো ঘটনাক্রমে দুপুরে যে হোটেলে খেতে গিয়েছিলাম, সেটিই খারাপ। ভাল হোটেল নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু খুঁজে বের করব কী করে? সেখানে উচ্ছে ডালের ঘরোয়া গন্ধ পেয়ে প্রাণমন চনমন করে উঠল। আপত্তির কোনও প্রশ্নই নেই, আমরা দুজনে এক কথায় রাজি হয়ে গেলাম। গল্পেসল্পে সময় কাটাতে কাটাতেই স্বহস্তে বন্ধুপত্নীর রন্ধন সমাপন হয়ে গেল, এবং ডাক পড়ল খাবার টেলিবে। খাবার মুখে তুলেই বুঝতে পারলাম রামুর এতখানি প্রত্যয়ের কারণ। সত্যিই খুব উপায়েদ হয়েছে খাদ্যবস্তু। বাঙালি ঘরে উচ্ছে ডালে সাধারণত ঘিয়ের ব্যবহার দেখি নি, আমাদেরও হয় না। কিন্তু রামুর স্ত্রী ঘি দিয়ে যে উচ্ছেডাল খাওয়ালেন তা এক কথায় অতুলনীয়। ডাল ভাজা সবজি আচার এবং পরিশেষে দুধ, দারুণ হলো আমাদের নৈশাহার।

খাওয়ার পর ওরা ছাড়তে চাইছিল না। এতকাল বাদে দেখা, তাই আমাদেরও ইচ্ছে করছিল না তাড়াতাড়ি চলে যেতে। দুই স্ত্রীকে আমরা দুই বন্ধু আমাদের ছেলেবেলার গল্প শোনাতে শুর করে দিলাম। খুব আগ্রহ সহকালে শুনতে শুনতে ওঁরা অবাক হয়ে যাচ্ছিলেন, মজাও পাচ্ছিলেন। ক্রমে স্মৃতিচারণায় আমরা এতটাই মশগুল হয়ে পড়লাম যে, কোথা দিয়ে রাত বেড়ে যাচ্ছিল সেদিকে কারুরই খেয়ালই থাকল না। অবশেষে যখন খেয়াল হলো, চিন্তায় পড়ে গেলাম রিকশ পাব কিনা। অবশ্য রামু আশ্বস্ত করল,

-আরে চিন্তা করিস না। লোক দিয়া দিমু। ও তাগো রিকশায় তুইল্যা দিয়া আসবো। একজনকে ডেকে বলে দিল। কিন্তু তার আগে আমাদের বলল,

-কাল লক্ষ্মীনারায়ণের ভোগ হবে। খিচুড়ি ভোগ। কাল তগো খিচুড়ির নেমতন্ন থাকল।

রামুর স্ত্রীও যোগ করলেন,

-কাল কিন্তু অবশ্যই আসবেন।

আমরা সম্মতি জানিয়ে বেড়িয়ে পড়লাম। রামুর লোক একটা রিকসা ডেকে এনে আমাদের তুলে দিল।

শেষবারের মতো ফরিদপুর এসেছিলাম রামুর বিয়ে উপলক্ষে। সম্ভবত পঁয়ষট্টি সালে। বিয়ের আগে রামুর বাবা এসেছিলেন কলকাতা। এসে আমাকে ধরে বসলেন রামুর বিয়েতে যোগ দিতে ফরিদপুর যেতে। উনি আমাকে খুব স্নেহ করতেন। ওঁর অনুরোধ উপেক্ষা করা কার্যত আমার পক্ষে ছিল অসম্ভব। কিন্তু তখন আমার পাশপোর্ট ছিল না। উনি বললেন,

-তুমি রামুর সব চাইয়া প্রাণের বন্ধু, তুমি না গেলে কি হয়? এখনও তো অনেক সময় আছে। পাশপোর্ট ভিসা এর মধ্যেই কইর‍্যা ফেলো।

অগত্যা পাশপোর্ট ভিসা করে সময় মতো রামুর বিয়েতে হাজির হলাম। রণের ফরিদপুরেই ছিল। রামু, রণের আর আমি, এই তিনজনের মধ্যে ছিল প্রগাঢ় বন্ধুত্ব। অন্যেরা আমাদের বলত হ্যালোজেন। রণের আর আমি সারারাত বিয়ের আসরে উপস্থিত ছিলাম। তখনকার দিনে মাড়োয়ারিদের বিয়েতে অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক একটি অনুষ্ঠান হতো। পাগড়ি মাথায় পুরোপুরি রাজস্থানী পোশাকে বর এক সুসজ্জিত ঘোড়ায় চেপে বেরুত আর তার পেছনে থাকত আত্মীয় পরিজন এবং বন্ধু-বান্ধবের বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা। আর থাকত পুলিশের ব্যান্ডপার্টি। বাজনার তালে তালে ধীর গতিতে এগিয়ে চলত শোভাযাত্রা। ফরিদপুরের জনসাধারণ রাস্তার দুপাশে দাঁড়িয়ে এই শোভাযাত্রা দেখত। সব মাড়োয়ারি পরিবারই থাকত বাজারে। বাজার থেকে বেরিয়ে শোভাযাত্রা কালীবাড়ি আসত এবং সেখানে পুজো দিয়ে অন্য পথে ফিরে যেত বিয়ে বাড়ি। ঘোড়ায় চেপে রাজস্থানী পোশাকে পাগড়ি মাথায় রামুকে খুব সুন্দর দেখাচ্ছিল। রণের আর আমি ওর ঘোড়ার পাশাপাশি হেঁটেছিহাম। যাত্রাশেষে জহথাবার পর্ব ভাহমতনই মিটে গেহ। কিন্তু রামুর বিয়ের রাতটি আন্যান্য রাতের মতো খুব সহজ ছিল না। জলখাবারের পরই প্রকৃতি রুদ্ররূপ ধারণ করল। শুরু হয়ে গেল প্রচন্ড ঝড়বৃষ্টির অবিরাম তান্ডব। রাতভর সেই তান্ডবে অনেক ঘর বাড়ি গাছপালা ভেঙে পড়েছিল। সে কথা মনে করিয়ে দিতেই রামুর স্ত্রী বললেন,

-আরে ব্বাপ, কী ঝড় আর কী বৃষ্টি।

ওদের ওপর দিয়ে অনেক ঝড় বয়ে গেছে। মুক্তিযুদ্ধের সময় ওদের দোকানে লুটপাট করেছিল রাজাকার বাহিনী। প্রাণনাশের চেষ্টাও হয়েছিল। ভয়ে শহর ছেড়ে, গ্রামে গিয়ে ওদের অনেকদিন আত্মগোপন করে থাকতে হয়েছিল। অনভ্যস্ত বাংলার গ্রামীণ পরিবেশে থাকা ওদের পক্ষে খুবই কষ্টকর ছিল। নিতান্ত অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদেই এভাবে থাকা ছাড়া ওদের আর কোন উপায় ছিল না।

প্রকৃতপক্ষে উনিশ শ সাতচল্লিশে ভারত ভাগের সময়েই এদেশের বিপুল সংখ্যক মানুষের জীবনে ঝড়ের সঙ্কেত ধ্বনিত হয়। একটি রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত এত মানুষের এত দিনের সহজ সরল জীবন প্রণালী, স্বদেশপ্রীতি, মাতৃভূমির প্রতি দায়বদ্ধতা, সজল সবুজ প্রকৃতির কোলে অমৃত জীবনসুধা পান, তিলতিল করে গড়ে ওঠা সংস্কৃতির সাথে একাত্মতা, বিশুদ্ধ বঙ্গসন্তানের অনাবিল হাসি আহ্লাদ কেড়ে নিতে পারে, এমন দৃষ্টান্ত মানব সভ্যতার ইতিহাসে অতি বিরল ঘটনা। হ্যাঁ, একটা ঝড় উঠেছিল। একটা নিঃশব্দ প্রবল ঝড়ের লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি ঘরের ভিত নড়ে উঠেছিল, মাতৃত্বের সুগভীর শিকড় আলগা হয়ে গিয়েছিল, সসম্মানে মাথা উঁচু করে বেঁচে থাকার সমস্ত আশা ভরসা অপাংক্তেয় বস্তুর মতো আস্তাকুড়ে চিরকালের মতো নিক্ষিপ্ত হয়েছিল।

কারো কারো মনে সংশয় থাকতে পারে কিংবা এখনও জাগতে পারে, হিন্দুদের তো কেউ দেশ ছেড়ে যেতে বলে নি, তবে কেন ধর্মের দিকে আঙুল তোলা? কেউ কেউ সরাসরি বলে নি ঠিক, তবে এমন সুন্দর দেশটাকে কেন পূর্ব পাকিস্তান করার প্রয়োজন হলো? এর ফলশ্রুতি হিসেবেই তো যত সব আলোকহীনতা এবং আবিলতা মুক্ত করতে শাহবাগের আকাশ বাতাস মুখরিত করে আজ যে কোটি কন্ঠের উদাত্ত আহ্বান, তাকে নিস্তব্ধ করে দিতে ধ্বংসের ইতিহাসের স্থান করে নেয়া এক শ্রেণির মানুষের (নাকি অমানুষের) অধর্মকে ধর্ম আখ্যা দিয়ে রক্তাক্ত তৎপরতা। পূর্ব পাকিস্তানের জন্মলগ্নে কিংবা তারও আগে পরে বস্তুত কেউ হিন্দুদের দেশত্যাগী হতে বলে নি, বরঞ্চ অনেককেই বলতে শুনেছি,

আপনারা নিজেদের দ্যাশ ছাইড়া যাইবেন কেন? তাইলে পুজ্যা-পার্বণ করব কারা? পুজ্যাডা কি খালি আপনাগো? বছরভর আমরাও তো চাইয়া থাকি ওই দিনগুলার লাইগ্যা।

লক্ষ্মী পুজোর সাড়ু খেতে প্রাণের দুটি সখা,
ঈদের সেমুই ছিল ওদের কলেজ দিয়া মাখা।

এই সখ্যতায় কার কী এমন বাদ সাধল? উৎসবে, ব্যসনে, দুর্ভিক্ষে, রাজদ্বারে, শ্মাশানে সর্বত্রই তো ছিল এই সখ্যতা, এই স্বজনতা। তাই বুঝতাম, আমরা দেশ ছাড়লে এই মানুষদের বুকে স্বজন হারানোর ব্যাথা অনুভূত হবে, তবু এটাও ঠিক, নিতান্ত মুষ্টিমেয় কিছু লোভী হিন্দুদের সম্পত্তির দিকে শ্যেন দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকত। ঠিক যেমনটা দেখেছি চৌষট্টির দাঙ্গায় ভারতেরও কিছু কিছু দুর্জনকে অরুরূপ ঘৃণ্য অপরাধ করতে। প্রকৃতপক্ষে এরা সর্বদেশে সর্বকালেই ছিল, আছে এবং থাকবেও, তবে হাতে গোনা নগণ্য সংখ্যায়। কিন্তু সংখ্যায় নগণ্য হয়েও ধর্মীয় জিগিরকে হাতিয়ার করে এরাই পরবর্তী কালে হয়ে ওঠে নিয়ামক শক্তি। এই সংশয়ের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার কোনো উপায় দেশত্যাগীদের কাছে ছিল কি?

দেশভাগ যে ধর্মের ভিত্তিতেই, সেটা ঐতিহাসিক সত্য। উনিশ শ সাতচল্লিশেই পূর্ববঙ্গের হিন্দুরা জন্মভূমি ছেড়ে কাতারে কাতারে পশ্চিমবঙ্গে আসতে শুরু করল। স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি কেউ কিছু বিক্রি করে, করলেও জলের দরে, কেউ বা একদাম ফেলেই চলে এলো। কোথায় মাথা গোঁজার ঠাঁই হবে, সপরিবারে কী খাবে, কী পরবে, অধিকাংশেরই কোনও স্থিরতা নেই, পরিকল্পনা নেই, দিশা নেই, আছে শুধু জন্মভূমি থেকে পালিয়ে যাওয়ার তাড়না, আশঙ্কার করাল গ্রাস থেকে মুক্তির করুণ আর্তি। অসহায় মানুষের অজানা ভয়ঙ্কর অন্ধকারে লক্ষ্যহীন উন্মত্তের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ার কিছু কিছু দৃষ্টান্ত এবং তার স্মৃতি নিতান্ত শিশুর বয়স থেকেই আমাকে বয়ে বেড়াতে হচ্ছে। অহেতুক এবং অকল্পনীয় এই মর্মান্তিক কাহিনির সাক্ষ্য বরাবর আমার জীবনসঙ্গী হয়ে থাকবে। দেশত্যাগের সময় গ্রাম থেকে ভারতে যাওয়ার পথে অনেকেই আমাদের ফরিদপুরের বাসায় উঠত ওখান থেকে ট্রেন ধরার জন্য। খুব ছোট ছিলাম তখন, সব মনে নেই। একটা কথা মনে আছে, কোনদিন ভুলব না। সবাই একবারেই ভারতে আসে নি। ইন্ডিয়া কেমন দেশ, সেটা অনেকেই অন্তত একবার ঘুরে দেখে এসেছে। এরকমই একজনের একটি কথা ইষ্টি রে কী ভিড়, কী ভিড়। গাড়ির মইধ্যে আর মানুষ ধরে না, মানুষের মাথার উপর মানুষ। আমার শিশু মনে তখন একটা ছবি আঁকা হয়ে গিয়েছিল, ট্রেনের মধ্যে নীচে একদল মানুষ বসে আছে আর তাদের মাথার উপর আর এক দল। কিছুতেই বুঝতে পারতাম না, কী করে একটা মানুষকে মাথার উপর বসিয়ে রেখে কেউ ট্রেনে করে ইন্ডিয়া যেতে পারে। মনে হতো ট্রেনে চাপলে আমিও ওইরকম দোতলা মানুষ দেখতে পাব। ছবিটা দীর্ঘকাল আমার মনে আঁকা ছিল, যতদিন না আমার কাকার বিয়েতে বরযাত্রী হিসেবে প্রথম ট্রেনে চেপে রাজবাড়ি যাই।

এই যে দেশত্যাগ করে লক্ষ লক্ষ হিন্দু জনতার ঢল নেমেছিল পশ্চিমবঙ্গের বুকে, বাড়ি ঘরদোর জমিজমা ফেলে ছিন্নমূল দিশেহারা জনসমদ্র রাস্তার পাশে কুঁড়ে ঘর বেঁধে, কারো কারো রিফ্যুজি ক্যাম্পের ক্ষুদ্র পরিসরে দিনের পর দিন আশ্রয় নিয়ে থাকা, এসব তো আর নিতান্ত ভুল করে করা নয়। ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগ, আতঙ্কিত হওয়া তো অত্যন্ত স্বাভাবিক। কার না আকাঙ্ক্ষা হয় ভবিষ্যত নিরুপদ্রব জীবনের?

এই ঝড় লেখা হয়ে গেল ইতিহাসের পাতায়। কলঙ্কিত ইতিহাস। কারণ, এই ঝড় সুনামির মতো প্রাকৃতিক বিপর্যয় নয়, সম্পূর্ণ মনুষ্যকৃত।

দীর্ঘ ঐতিহ্যমন্ডিত একটি দেশকে টুকরো করার প্রতি আপামর জনসাধারণের সমর্থন তো ছিল না। ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগ হলেও, তা কিন্তু ধর্মীয় কারণে হয় নি। মুষ্টিমেয় স্বার্থান্বেষী কিছু ক্ষমতালোভী ক্ষমতায় আসীন হওয়ার জন্য সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িকতাকে অমানবিক ও ঘৃণ্যভাবে হাতিয়ার করেছিল। ওই বয়সে এসব না বুঝলেও ঝড়ের আঁচ কিন্তু টের পেতাম দলে দলে দেশত্যাগের হিড়িক দেখে।

অনন্তকাল ধরে একই ভাষা একই সংস্কৃতি আমাদের ধমনীতে একই সাথে একই রকম ভাবে প্রবহমান। তবুও, কোন এক অশুভ শক্তির প্রভাবে আমরা এপার-ওপার হয়ে গেলাম। অথচ নীরেন চক্রবর্তী-জয় গোস্বামী-সামসুর রহমানরা, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়-আখতারউজ্জামান ইলিয়াসরা, মৃণাল সেন-গৌতম ঘো – তনবীর মোকাম্মেলরা কি একই ভাষায় একই মননে অখন্ডিত বাংলার ক্যানভাসে নিয়তই সৃষ্টির জাল বুনে যাচ্ছেন না? আমরা, মানে এপারের আমরা যখন ওপারের কোন বন্ধুকে বুকে জড়িয়ে ধরি এবং বন্ধুটি যদি বলে ফেলে চল আমরা বর্ডারটা তুলে দিই, তখন অখন্ড বাংলার হৃদয় চিরে জবরদস্তি চাপিয়ে দেয়া সীমারেখার অস্তিত্ব কোথায় থাকে? তাই তো পূর্বপাকিস্তান একিদন বাংলাদেশ হয়ে যায়। তখন এপার ওপারের তোমরা-আমরা কি এক দুর্দমনীয় শক্তিতে সবাই শুধু আমরাই হয়ে যাই না, একাত্মতার আবেগে কন্ঠ কি ধরে আসে না?